জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি–জুন ২০২১

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনাদির ভূমিকা : ফেনী জেলা

শামছুল কবির*

Abstract

Bangladesh consisted by the Sixty four districts. Feni district is one of them. Feni district is important role play in the Liberation War. Many freedom fighters attended in the war of liberation as the others districts of Bangladesh. Bangladesh was divided eleven sectors during the liberation war. Feni district was included by the second sectors and Captain Jafor Imam was the commander in the Feni district. He organized the peoples, students and freedom fighters etc to involve the liberation war. Many organizations were work and participent in the liberation war in feni district; as they were Awami League, student league, freedom fighters, arms forces, Polices forces, Mujib groups etc. On the other hand Jammat Islami, Shanti Bahini, Al Badar, Al Shams etc were supported the Pakistani solders. Many long time freedom fighters were struggle and war in the feni distric in the Liberation War. As a regult, in the 6th December 1971 Feni district was free from enemies and independent. So this paper is hightlighted to the organizations were vital role play in the War of Liberation in Feni distric.

ভূমিকা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু নব গঠিত পাকিস্তান সরকারের স্বৈরশাসন ও শোষণ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ফলে প্রতিবাদী বাঙালি জাতিও নীরব থাকেনি। বাঙালিরা তাদের অধিকার আদায় ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যথাযথ ও সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে কোলকাতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর (মুক্তিবাহিনী) সদরদপ্তরে ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই সেক্টর কমান্ডারদের এক বৈঠকে সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। আর ফেনী জেলা ২ নং সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) এবং মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) দায়িত্ব পালন করেন; এবং ফেনী জেলার কমান্ডার হিসেবে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (পরবর্তীতে মেজর) দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় ফেনী জেলায়ও সেক্টর কমান্ডার, বিভিন্ন সংগঠন যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সংগঠন (সংগ্রাম কমিটি, মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, যৌথবাহিনী, মিত্রবাহিনী, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ ইত্যাদি), মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী সংগঠন(শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ইত্যাদি), সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান, ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র, সরকারি দলিলপত্র ইত্যাদি পঠন পাঠনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রবন্ধটি রচিত হবে ।

২. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি: এই পদ্ধতির মাধ্যমে ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধা, সহযোগী, প্রত্যক্ষদর্শী ও জনসাধারণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্থান, সমাধি ইতাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করে গবেষণা কর্মে উপস্থাপিত হবে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র দেশের ন্যায় ফেনী জেলায় যারা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের যুদ্ধকালীন অবস্থা, যুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উপস্থাপন ও মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতি ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা সহ বস্তুনিষ্ঠভাবে মুক্তিযুদ্ধে ফেনী জেলার বিভিন্ন সংগঠনাদির ভূমিকা কীরূপ ছিল তার সঠিক ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা ও নব প্রজন্মের নিকট প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণার যৌক্তিকতা

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণের যে ভূমিকা ছিল তা খুবই প্রশংসনীয়। মুক্তিযুদ্ধের উপর কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও এই অঞ্চলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী জনগণের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়াদির উপর সঠিক ও তথ্যনির্ভর পূর্ণাঙ্গ তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। ফলে আলোচ্য গবেষণায় ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ও স্বাধীনতা-বিরোধী সংগঠনের অবস্থান যথাসম্ভব সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সর্বোপরি বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত ইতিহাস জানা থেকে নব প্রজন্মকে রক্ষা করা সহ সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ফেনী জেলায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সংগঠনাদির ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

ফেনী জেলার ভৌগোলিক পরিচয়

বাংলাদেশ বর্তমানে ৬৪টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। তন্মধ্যে ফেনী জেলা অন্যতম স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে রয়েছে বর্তমান ফেনী জেলা। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে নোয়াখালী জেলাকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে ফেনী অন্যতম একটি জেলা। প্রাচীন জনপদ সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফেনী জেলা। আয়তন হিসেবে ফেনী

জেলা বাংলাদেশের ৬১তম জেলা। এর মোট আয়তন ৯১৮.৩৪ বর্গ কি.মি.। এ জেলাটি ২২°.৪৪′ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৩°.১৭′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°.১৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯১°.৩৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।[১] ফেনী জেলার উত্তরে কুমিল্লা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা অবস্থিত।[২] ৬টি উপজেলা নিয়ে ফেনী জেলা গঠিত। উপজেলাগুলো হলো- ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী ও ফুলগাজী।[৩] ফেনী জেলা ভারতের সীমান্তবর্তী ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবস্থিত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির নিকট এই জেলার গুরুত্ব খুবই বেশি ছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ফেনী জেলায় বিভিন্ন সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী সংগঠনগুলোও তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। নিম্নে ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন, বিরোধী সংগঠন, প্রশিক্ষণ শিবির ও প্রশিক্ষণ দানসহ অত্র জেলায় যেসব সংগঠনাদি ও রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেসব সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে গ্রহণ করে আলোচ্য প্রবন্ধে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। ফেনী জেলা ২নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর সদরদপ্তর মেলাঘরে (ভারত) অবস্থিত ছিল।[৪] এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল- ৩০ সেপ্টেম্বর) এবং মেজর এ টি এম হায়দার (অক্টোবর-১৬ ডিসেম্বর) দায়িত্ব পালন করেন।[৫] ২নং সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার সুবিধার্থে আবার এটাকেই ছয়টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। সাব-সেক্টরগুলো হলো - ১. গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা ২. মন্দভাগ ৩. শালদা নদী ৪. মতিনগর ৫. নির্ভয়পুর ৬. রাজনগর।[৬] উল্লেখ্য যে, রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীনে ফেনী জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (পরবর্তীতে মেজার), উপ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন শহিদুল ইসলাম ও লেফটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান।[৭] তাছাড়া নুরুল হক (এম.এন.এ) ফেনী অঞ্চলের রাজনৈতিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৮]

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও সংগ্রাম কমিটি

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ের পরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১মার্চ ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে পূর্ব ঘোষিত ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে সারা পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্মসূচি প্রদান করেন। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিলে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালালে সে রাতেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ফলে ২৬ মার্চ সকাল বেলা ফেনী জেলার সার্কিট হাউজ লাউঞ্জে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাপ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। উক্ত সভায় পাকবাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতা ঘোষণার কথা তুলে ধরেন।

ফেনী জেলায় জয়নাল আবেদিন ও জহির উদ্দিন বাবরের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং ফেনী স্টেশন রোডস্থ আজিজ আহমদ চৌধুরী গোলাপ মিয়ার দালানের সাপ্তাহিক বার্তাবহ পত্রিকার অফিসে একটি কন্ট্রোলরুম (নিয়ন্ত্রণ কক্ষ) স্থাপন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন সাজেদুল আলম জামশেদ, আবু তাহের ভুঁইয়া, কাজী নূর নবী, আনিছুল হক, ওয়াজিউল্লা ভুঁইয়া, আকরাম হোসেন, মুজিবুল হক ও রকিবুর রহমান প্রমুখ। আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহম্মদ তাঁর বাঁশপাড়ার বাসভবনে সংগ্রাম কমিটির সার্বক্ষণিক কন্ট্রোলরুম (নিয়ন্ত্রণ কক্ষ) স্থাপন করেন। এই কন্ট্রোলরুমে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন আওয়ামী লীগ নেতা এ কে এম শামছুল হক, মোস্তফা হোসেন, ইউনুস চৌধুরী, নুরুল ইসলাম হাজারী, নুরুল হুদা, সুজাত আলী ভুঁইয়া, শ্যামলকান্তি বিশ্বাস, এম এস হুদা ও এ বি এম তালেব আলী প্রমুখ।[৯] এই সকল সংগ্রাম কমিটিই মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ফেনী জেলার সংগ্রাম কমিটিগুলোর সদস্যগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সদস্য সংগ্রহ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মুক্তিযুদ্ধের কৌশল শিখানো, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন।

আওয়ামী লীগ

ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফেনী জেলা আওয়ামী লীগ সংগঠনের অনেক নেতা, কর্মী ও সমর্থক মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল ও সাধারণ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণেও উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই ভারতে চলে যান কিন্তু সেখানেও তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। ফেনী জেলার আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহম্মদ, এ কে এম শামসুল হক, মোস্তফা হোসেন, রুহুল আমিন, নুরুল ইসলাম ও নুরুল হুদাসহ প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১০]

ছাত্র সংগঠন ও ছাত্রলীগ

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্রলীগ বিশেষ অবদান রেখেছিল। সেই সময় ফেনী জেলার ছাত্রনেতাদের মধ্যে জয়নাল আবেদীন, মিজানুর রহমান, নেফায়েত উল্লাহ, মোস্তফা ভুঁইয়া, সাইফুল আজম জাহাঙ্গীর, আজিজুর রহমান ইকবাল, মোস্তফা কামাল, নবী নেওয়াজ, আব্দুর রাজ্জাক, হিমাংশু বণিক, কাজী হারুনসহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১১] এদের অনেকে মুজিব বাহিনীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ফেনী জেলার ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংগঠনের অনেকেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সাধারণ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন, বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস দিয়েছিল। এই সকল ছাত্রনেতা ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল যা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ভাসানীপন্থী ন্যাপ সংগঠন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই ন্যাপ সংগঠনটি তাদের কাজ শুরু করে। নুরুল হক মেহেদী, আব্দুর রহমান, মাজহারুল হক চৌধুরী ও গোফরান মামুনসহ প্রমুখ এই দলে ছিলেন। ৫০ জনের মতো একটি গ্রুপ পূর্ব থেকেই গ্রামাঞ্চলে কাজ করেছিল । তাঁরা সকলেই চারু মজুমদারের অনুসারী ছিলেন।[১২] এই সংগঠনের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা করেছিল। ফলে এই সংগঠনটি ফেনী জেলায় মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মুক্তিফৌজ ও মুক্তিবাহিনী (এমএফ ও এফএফ)

মুক্তিযোদ্ধারা এফএফ ও এমএফ নামে দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল।[১৩] এফএফ মানে Freedom Fighter. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দেশরক্ষা বাহিনীর বাঙালি জাতীয়তাবাদী সদস্য তথা নিয়মিত বাহিনীর সদস্য দ্বারা এফএফ বাহিনী গঠিত হয়। তাই এই বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনীও বলা হয়।[১৪] আর এমএফ মানে Mukti Fauj। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে সংগঠিত পরিষদের বিভিন্ন শাখার সদস্য ও তাদের অনুসারী বেসামরিক জনগণ দ্বারা এমএফ গঠিত হয়।[১৫] তাই এই বাহিনীকে অনিয়মিত বাহিনীও বলা হয়।[১৬]

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ যোদ্ধাগণই মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের প্রথমে মুক্তিফৌজও বলা হতো।[১৭] মুজিবনগর সরকারের অধীনে থেকে ০১ নম্বর হতে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে যারা দেশের ভেতরে বা বাহিরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন কিংবা যারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন বা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কিংবা যারা সরাসরি যুদ্ধ করেছেন কিংবা যারা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার কাজে রত ছিলেন বা যারা মুজিবনগর সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন সকলেই মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (EBR), ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (EPR), অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ, আনসার, আর্মি, শ্রমিক ও কৃষক ইত্যাদিকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ গঠিত হয়।[১৮]

জোন কমান্ডারগণ ফেনী জেলায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাদের নেতৃত্বে ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জোন কমান্ডারগণ মুক্তিযোদ্ধাদেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংগঠিত করেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছিলেন। ফলে অত্র জেলার মুক্তিযোদ্ধাগণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল/সরকারি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৪.০৬.২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ফেনী জেলার ২২৮৭ জন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা অনুমোদন করেন।[১৯]

মুজিববাহিনী বা বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুজিবনগর সরকার শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল ইসলাম খান, আব্দুর রাজ্জাক, আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজসহ প্রমুখ

যুব ও ছাত্রনেতাকে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের দায়িত্ব দেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নির্দেশে উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ সংগৃহীত ছাত্র ও যুবকদের সমন্বয়ে মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করেন।[২০] নভেম্বরের মধ্যে এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাত থেকে আট হাজার।[২১] এদেরকে ৪৫ দিনের একটি বিশেষ ধরনের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[২২] মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে এই বাহিনীর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১১ মে উত্তর প্রদেশের দেরাদুনের অদূরে চকরাতায় যুবনেতারা যুব শিবির গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন এবং এখানে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া আসামের হাফলং এ ধরনের যুব শিবির গড়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই দুই স্থানে প্রশিক্ষিত সদস্যগণ পরবর্তীতে মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত হয়।[২৩] মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ৪ জন ছাত্রনেতাকে এইসব অঞ্চলে মুজিব বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা : বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ঢাকার অংশ বিশেষ এর দায়িত্বে ছিল- কমান্ডার শেখ ফজলুল হক মণি, উপ-কমান্ডার আ স ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং এর সদর দপ্তর আগরতলা (ত্রিপুরা, ভারত) ছিল।[২৪]

উল্লেখ্য যে, ফেনীতে বি এল এফ-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেই ঢাকা থেকে আগত ছাত্রনেতা ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আ.স.ম আব্দুর রব, মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, একরামুল হক, অহিদুর রহমান অদু প্রমুখ। বিএলএফ কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তাঁরা ফেনী জেলায় আসেন এবং তখন থেকেই ফেনীতে বিএলএফ-এর কার্যক্রম শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার সুবিধার্থে ফেনী জেলাকে ডি-জোনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর অধিনায়ক ভিপি জয়নাল, ফেনী উপজেলার অধিনায়ক নূরন্নবী, ছাগলনাইয়া উপজেলার অধিনায়ক শহীদ মোস্তফা কামাল পাশা, পরশুরাম উপজেলার অধিনায়ক মোতালেব ছিলেন।[২৫]

উপরের উল্লেখিত বিএলএফ কমান্ডারগণের মাধ্যমে ফেনী জেলায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তাঁরা মুক্তিফৌজের সঙ্গে কখনও একসাথে, আবার কখনও পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ফেনী জেলার অনেকেই জীবনের মায়া ত্যাগ করে ও ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র সংরক্ষণ (লুকিয়ে রাখা) ও সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা সকলেই ফেনী জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকসেনা ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। বিএলএফ কমান্ডারদের মাধ্যমে ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তাঁরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন, যুদ্ধের কৌশল শিখাতেন, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন ও শত্রুর সাথে সম্মুখযুদ্ধ কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা শিখাতেন।

গেরিলা বাহিনী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে সেক্টরের অধীনে এই গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার শত্রুর বিরুদ্ধে হঠাৎ আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিকারক যোদ্ধাগ্রুপ 'গেরিলা' নামে পরিচিত ছিল।[২৬] এরা শত্রুর ওপর হঠাৎ ও তড়িৎ গতিতে আঘাত এনে দ্রুত পলায়ন (Heat and run) পদ্ধতির অনুসরণ করত; যাকে বলা হয় মারো এবং নিরপদে সরে যাও। এদের আক্রমণের ভয়ে পাকিস্তানি

বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা সর্বদা আতঙ্কিত থাকত। যে কোনো সময় তারা গেরিলাদের প্রচণ্ড হামলার সম্মুখীন হতো।[২৭] উল্লেখ্য, মুক্তিবাহিনীর পরিচালিত গেরিলা অপারেশনের সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'।[২৮] বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল।

ইপিআর বাহিনী (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)

পাকিস্তান শাসনামলের একটি আধা-সামরিক বাহিনী যা প্রধানত বাংলাভাষী সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠে। এই বাহিনী সাধারণত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে দেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও তাদের ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইপিআর-এর অনেক সদস্য নিজের জীবন বাজি রেখে, চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফেনী জেলার ইপিআর সদস্যদের অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন। এমনকি তাঁরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

ইপিপি বাহিনী (ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ)

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক ইপিপি সদস্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তদ্রূপ ফেনী জেলার পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্যও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি অনেকেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন- হাবিলদার আব্দুল হক, হাবিলদার আব্দুর রব, হাবিলদার আবুল কালাম আজাদ, হাবিলদার জয়নাল আবেদীন, ৭১' এর সময় পুলিশ একাডেমির ভাইস প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, হাবিলদার আব্দুল কাদের, হাবিলদার ফজলুল হক, হাবিলদার শামসুল হুদা, প্রধান হাবিলদার সামছুল হক, হাবিলদার আবুল কাসেম ও হাবিলদার সেফায়েত উল্লাহসহ প্রমুখ।[২৯]

আনসার বাহিনী

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আনসার বাহিনীর অনেক সদস্য পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় ফেনী জেলার আনসার সদস্যরাও মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তন্মধ্যে এ কে এম শাহজাহান (চাটখিল) ও মো. জয়নাল আবেদীন (সদর) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩০]

মিত্রবাহিনী

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের পশ্চিমাংশ আক্রান্ত হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক ভাষণে বলেন– আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।[৩১] এরপর তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান

বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে ভারতীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন থেকেই ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর এই সদস্যদের মিত্রবাহিনী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৩২] মিত্রবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে অভিযান ও যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল যা বাঙালির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক হয়। মিত্রবাহিনীর এরূপ সহযোগিতার কারণেই বাঙালি জাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়।

যৌথ বাহিনী

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ অবস্থা বিরাজ করলে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠন করা হয় যৌথ বাহিনী বা কমান্ড। ৩ ডিসেম্বর ভারতের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বে ঘোষিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড। আর এই যৌথ বাহিনী বা কমান্ডের নিকটই পাকিস্তানি বাহিনী মাত্র নয় মাসের মধ্যে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।[৩৩]

মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ফেনী জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। ক্যাপ্টেন এনামুল হক ফেনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফেনীর প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পি.টি.আই) মাঠ, ফেনী কলেজ মাঠ, ফেনী পাইলট স্কুল, ফেনীর মিজান ময়দান ও মাদ্রাসা মিলিয়ে একটি কেন্দ্র এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সাবেক ইপিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন।[৩৪] এছাড়াও ফেনী কলেজ, দাগনভুঁইয়া, দুধমুখা, রাজাপুর, সিন্দুরপুর, সোনাগাজী, বিষ্ণুপুর, নবাবপুর, আমিরাবাদ, বক্তারমুন্সি, পরশুরামপুর ও ফুলগাজী প্রভৃতি স্কুল মাঠে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। এইসব প্রশিক্ষণে কেন্দ্রে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও ছুটি ভোগরত কয়েকজন সদস্যের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।[৩৫] এইসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন এবং রাইফেল চালানো, গ্রেনেড নিক্ষেপ, গেনেড নিয়ে ক্রলিং করানো, বোম ফিটিং ও ফাটানো, নিরাপদে ফিরে আসাসহ ইত্যাদি বিষয়ে কৌশল ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।[৩৬] ফেনী জেলার অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও বিএলএফ সদস্য প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের চলে যায়। তাঁরা ভারতের চোত্তাখোলা ইয়থ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের এনিক ও রাজনগর ক্যাম্পেও প্রশিক্ষণ নেয়। অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ (এমএনএ) ও বিছমিল্লা মিয়া (এম.পি) রাজনগরে একটি ইয়থ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করেন। চোত্তাখোলা ইয়থ ক্যাম্পে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার ছাত্র-যুবক মুক্তিযোদ্ধা একসাথে সমবেত হয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। ভারতের এইসব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে খাজা আহম্মদ, এবিএম তালেব আলী, রুহুল আমিন, শামসুল হক, সৈয়দ মিয়া, শ্যামলকান্তি বিশ্বাস, এনামুল হক চৌধুরী, সার্জেন্ট শামসুল হক, ফজলুল হক, সুবেদার আবু আহম্মদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ নেয়। এছাড়াও জয়নাল আবেদিন (ভিপি), ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম ও এ

কে এম গোলাম কাদের প্রমুখ বিলোনিয়া মডেল স্কুল ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় এবং একসাথে প্রশিক্ষণ নেন।[৩৭]

নারী সংগঠন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় ফেনী অঞ্চলেও পুরুষদের ন্যায় নারীরাও মুক্তিসংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় ফেনী জেলার বেশ কিছু নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর আনা-নেয়া করেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন, অস্ত্র সংগ্রহ করা, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন ও অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। এমনকি এই অঞ্চলের নারীরা প্রতিনিয়ত পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর ও আলশামসদের হুমকি সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং রান্না করে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রয়োজনে সেবাও করেছেন; এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের ঘরে, বাথরুমে গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে ও আশ্রয় দিয়ে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই অঞ্চলের নারীরা বিভিন্ন চিঠি, লিফলেট, পত্রিকা বিভিন্ন স্থানে (অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প, হাসপাতাল), বিভিন্ন জনের (ছাত্র-শিক্ষক, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গেরিলা বাহিনীর সদস্য) কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বার্তাবাহক হিসেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন এবং এক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

স্বাধীনতার বিরোধী সংগঠন

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ফেনী জেলার যারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি, পাকস্তানি বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিল, এ অঞ্চলের নিরীহ মানুষকে হত্যা, নারীদের ধর্ষণ, নির্যাতন, ঘর-বাড়ি ও দোকান-পাট লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত ছিল সেই সব সংগঠন ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:-

শান্তি কমিটি

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক বাঙালি নিধন অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করল। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ৭১' এর ২৬ মার্চ বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে শুরু করল। ফলে এরূপ পরিস্থিতি মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াত ইসলামী নেতা গোলাম আজম ও হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ৯ এপ্রিল ১৪০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।[৩৮] ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল নাগরিক শান্তি কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' রাখা হয়। কমিটির কাজ দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।[৩৯] এই কমিটিগুলোর মূল কাজ ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অস্বীকার করা। বাংলাদেশের নিরীহ, দেশপ্রেমিক ও মুক্তিকামী জনগণকে নির্যাতন, হত্যা ও তাদের উচ্ছেদ করায় এদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা ছিল। তারা স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের হত্যার জন্য তালিকা সরবরাহ করে পাকিস্তানি সেনাদের নিকট পৌঁছাতো। এই শান্তি কমিটির পরিকল্পনা ও নির্দেশেই রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ প্রভৃতি ঘাতক সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।[৪০] ফেনী জেলার শান্তি কমিটির যে সকল সদস্য পাকিস্তান সরকার এবং পাকবাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছিল তারা হলো- ১. হামিদুল হক চৌধুরী, কার্য নির্বাহী সদস্য, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি; ২. মাওলানা আব্দুল জব্বার খদ্দর, কার্য নিবাহী সদস্য, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি; ৩. খায়েজ আহমেদ, আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, ফেনী জেলা।[৪১]

উল্লেখিত শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের নির্দেশে শান্তি কমিটির সদস্যরা ফেনী জেলার বিভিন্ন স্থানে শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা, ঘর-বাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছিল এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্যপ্রদান এবং নারীদেরকে ধরে এনে পাকসেনাদের কাছে হস্তান্তর ও ধর্ষণ প্রভৃতি ন্যাক্কারজনক কাজে লিপ্ত ছিল।

রাজাকার বাহিনী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের মে মাসে মাওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে খুলনার আনসার ক্যাম্পে সর্বপ্রথম 'রাজাকার' বাহিনী গঠিত হয়। পরবর্তীতে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়েছিল।[৪২]

উল্লেখ্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফেনী জেলায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ফেনী জেলার রাজাকার কমান্ডার হিসেবে নুরুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করেছিল। এছাড়াও অত্র জেলার অন্যতম রাজাকার ছিল- মাওলানা মোস্তফা, মো. মাইনউদ্দিন, মোহাম্মদ ইলিয়াস, আমিনুল হক, লিয়াকত আলী, আবু নছর, আব্দুল গোফরান প্রমুখ।[৪৩]

ফেনী জেলার রাজাকার বাহিনী গঠিত হওয়ার পর এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপরে উল্লেখিত রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা ফেনী জেলার সাধারণ জনগণকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করত। তারা ব্লাকমেইলিং, ছিনতাই, অগ্নিসংযোগ, গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যাওয়া, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, মুক্তিপণ আদায়, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধান দেওয়া, যুবতি নারী ধরে এনে পাকিস্তানি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া, দোকান-পাট লুট ও অগ্নিসংযোগ এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কাজের সাথে জড়িত ছিল।[৪৪]

আলবদর বাহিনী

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করা এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আলবদর বাহিনী গঠন করা হয়।[৪৫] বাংলাদেশে আলবদর সদস্যরা সন্ত্রাস, খুন ও রাহাজানির মাধ্যমে জনমনে সব সময় আতঙ্ক সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকে। এদেরকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খুনি গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৪৬] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আলবদর বাহিনীর সদস্যরা ফেনী জেলার অনেক শিক্ষিত, বরেণ্য ও বুদ্ধিজীবী মানুষকে হত্যা এবং নির্যাতন করেছিল। তন্মধ্যে ফেনী জেলার কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট

শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, শিবসাধন চক্রবর্তী ও সেলিনা পারভীন প্রমুখ শহিদ হন।[৪৭]

আলশামস বাহিনী

'আলশামস' আরবি শব্দ। এর অর্থ সূর্য সৈনিক। 'আলশামস' বা 'সূর্য সৈনিক' নামধারী আধা সামরিক একটি আদর্শবাদী বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য গঠন করা হয়। এদের কার্যকলাপ 'আলবদর' বাহিনীর অনুরূপ ছিল। শান্তি কমিটির সদস্যগণ এদের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ দিতো।[৪৮] মুক্তিযুদ্ধের সময় ফেনী জেলায় এই বাহিনীর তেমন কোন কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম ছিল না বলেই চলে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো ফেনীর জেলায়ও বিভিন্ন সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, যৌথবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও মুক্তিকামী বিভিন্ন সংগঠন এই অঞ্চলের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি বাহিনীসহ বিরোধী সংগঠনগুলোর সাথে এ অঞ্চলের মুক্তিকামী জনগণের মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ, অপারেশন ও সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। কিন্তু ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ সংগঠনগুলি খুবই সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল বিধায় অপশক্তিকে পরাজিত করে এ অঞ্চলকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন করতে সক্ষম হয় এবং বাঙালি জাতি তাদের বিজয় ছিনিয়ে আনে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ আমীন, *জেলা, উপজেলা ও নদ নদীর নামকরণের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১৩৯

২. *তদেব*, পৃ. ১৩৯

৩. *তদেব*, পৃ. ১৪০

৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ১০*ম খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪), পৃ. ০৩-০৫

৫. *তদেব*, পৃ. ০৪

৬. খালেদ মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭৪; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৭. খালেদ মোশাররফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

৮. আসাদুজ্জামান আসাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ২০২

৯. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী* (ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৭৪

১০. *তদের*, পৃ. ৭৪

১১. জহিরুল ইসলাম, *একাত্তরের গেরিল* (ঢকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১৮৬

১২. জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ. ৭৭

১৩. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, *১ম খণ্ড* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ১৪৫

১৪. ১৯ মে ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, ইপিআর, ইবিআর, পুলিশ ও আনসার ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিফৌজকে পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ সামরিক বাহিনী গঠন করা হয়েছে তাদের এক ধরনের পোষাক থাকবে এবং তাদের কমান্ডিং অফিসার হবে চীফ অব স্টাফ, দেখুন, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২০২; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *১০ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৫

১৫. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬; মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৬০

১৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *১০ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৫

১৭. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

১৮. বিমলেন্দু হালদার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৭৮

১৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *১০ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

২০. মইদুল হাসান, *মূলধারা '৭১* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬), পৃ. ৭৮

২১. Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka : Bangladesh Books International, 1980), p. 115

২২. মোল্লা আমীর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলা* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০৯), পৃ. ১৩২

২৩. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭; মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

২৪. শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ)* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৮৫-৮৬

২৫. জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬

২৬. এম.এ বারি, *মুক্তিযুদ্ধে রক্তিম স্মৃতি* (ঢাকা: রাণীমহল প্রকাশনী, অনুল্লেখিত সাল), পৃ. ১১২

২৭. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, *২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

২৮. জে.এফ.আর. জেকব, *স্যারেন্ডার এ্যাট ঢাকা*, *একটি জাতির জন্ম* (আমিনুর রহমান অনুদিত) (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯),পৃ. ৬৯.

২৯. এ. এস. এম সামছুল আরেফিন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, *১ম খণ্ড* (ঢাকা: পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ২০১২), পৃ. ২৬৫- ২৭৬

৩০. এ.কে.এম গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১১৬-১১৭

৩১. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪২

৩২. *তদেব*, পৃ. ৫৪৪; মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, *৩য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৩৩. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭

৩৪. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪

৩৫. *তদেব*, পৃ. ৫৭

৩৬. *তদেব*, পৃ. ৫২-৫৩

৩৭. *তদেব*, পৃ. ৮৫-৮৭

৩৮. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১, পৃ. ০৫

৩৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৭ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২). পৃ. ৭১৩

৪০. সুকুমার বিশ্বাস, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০১), পৃ. ১৭

৪১. এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৪-৪২০

৪২. আসাদুজ্জামান আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

৪৩. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩

৪৪. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৯৩

৪৫. সিরাজুল ইসলাম(সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ২৮

৪৬. মুনতাসীর মামুন, *রাজাকারের মন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ১০

৪৭. মো. শাহ আলমগীর (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাংবাদিক* (ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫), পৃ. ৩৩, ৯৪ ও ১১০

৪৮. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ২১